UG - HONS. - Sem II - Bengali
CC4 : Code : BNGACOR04T
Unit III : বাংলা কাব্য-ধারার উদ্ভব ও বিকাশ

আধুনিকতার পটভূমি, স্বরূপ ও বাংলা আধুনিক কবিতার যাত্রা

মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

'সাহিত্যের পথে'র (১৩৪৩) 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন :

> 'এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্য তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'

—এই মর্জি বা অভিপ্রায় তথা মানসতা অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময়ের আধারে প্রকাশ পায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের আইয়ুব লিখিত ভূমিকায় তাই বলা হয়েছে : 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।' (শ্রাবণ ১৩৪৬, জুলাই ১৯৪০)

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষিতে বাংলা আধুনিক কবিতা-নির্মাণের এক-লক্ষ্য ব্রতই উদ্‌যাপিত হয়েছে নিরন্তর রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির ক্ষুরধার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে। আধুনিক কবিরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের সামগ্রিক নিষ্ফলতাকে—তাঁদের স্বাতন্ত্র্য-বিসর্জন দিয়ে রবিচ্ছায়ায় লীন হবার অমোঘ পরিণতিকে। এ বিষয়ে এই আধুনিক কবিদেরই একজন বুদ্ধদেব বসুর অনুধাবন উল্লেখ্য :

> 'তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকমসদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না— ... তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ।' (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা, প্র. প্র. ১৯৫৪, জুন, ২০০০, পৃ. ১০৩-১০৪)।

আর একদিকে নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বেশ কিছু কবিতা থেকে তাঁরা বুঝলেন যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু—স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করা সম্ভব। নজরুলের ঋজু প্রত্যক্ষ অসংবৃত বিদ্রোহী উচ্চ সুর, মোহিতলালের ভোগবাদী তীব্র আর্তি এবং যতীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবণ, তর্কাত্মক উচ্চারণের মাধ্যমে রোমান্টিক ভাববিলাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় উদ্‌গত একান্তভাবে বাস্তববাদী, সত্যনিষ্ঠ, দুঃখবাদী ভাবনা-চিন্তার প্রকাশে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির প্রয়াসকে প্রত্যক্ষ করলেন।

কল্লোলীয় কবিদের মধ্যে জাগ্রত হল তীব্র রবীন্দ্রবিরোধিতা—তাঁদের অভিযোগ হল রবীন্দ্র-কাব্যে বাস্তবতা-কামনা-বাসনার প্রগাঢ় উপস্থিতি নেই। এঁদেরই একজন বুদ্ধদেব বসু পরবর্তীকালে লিখেছেন :

> 'মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১)।

এবং মুশায়েরা

Scanned with CamScanner

আরেক কল্লোলীয় কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে এমনই রবীন্দ্র-বিরোধিতার কথা :

> 'বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেন নি রবীন্দ্রনাথ—তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ।' (কল্লোল যুগ, প্র. প্র. ১৩৭২, পৃ. ১৩১)

সাময়িকভাবে হলেও রবীন্দ্র-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল বিশেষত বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে। 'কল্লোল' পত্রিকা ছাড়াও 'কালিকলম'—'প্রগতি'র পাতায় এহেন প্রতিক্রিয়া ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আধুনিক কবিদের এই প্রতিক্রিয়ায় আতিশয্য থাকলেও তাদের এ হেন রবীন্দ্র-বিরোধিতা এক সদর্থক রূপ লাভ করল রবীন্দ্র-অতিক্রমণের মধ্যে দিয়ে। এই আক্রমণের পথ অবারিত হল মূলত দুটি উপায়ে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিক বিপুল প্রসারিত ভাণ্ডার থেকে পরিগ্রহণ এবং রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণের মাধ্যমে। এহেন পরিস্থিতিতেই কোনরকম রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছাড়াই সুধীন্দ্রনাথের লেখনীতেই এই পাশ্চাত্য-পরিগ্রহণের তাগিদ প্রকাশ পেল :

> 'এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।'

তাঁদের কবিতায় আধারিত হল পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিফলিত সংশয়, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা, বিদ্রোহের মনোভাব। আর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকরণগত নানা আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করল।

পাশ্চাত্য আধুনিক কবিতার যে ভাবপরিমণ্ডলের সংক্রাম আধুনিক বাংলা কবিতায় অনুভূত হল তার মোটামুটি সূচনাচিহ্ন প্রথম মহাযুদ্ধেই আমরা নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু ১৯১৪-র অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নানা বিস্ময়কর উদ্ভাবনের ফলে পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এরই সঙ্গে যুক্ত হল প্রথম মহাযুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতা রক্তস্নাত, বিমূঢ়, বিহ্বল প্রতীচ্য উপলব্ধি করল প্রচলিত নৈতিক ধ্যানধারণা তথা মূল্যবোধ যুদ্ধ-দানবের বিশাল পায়ের তলায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

উনিশ শতকের শেষ থেকেই পরপর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবী এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। ১৮৯৫ সালে রন্টজেন রঞ্জনরশ্মি (X-rays) আবিষ্কার করলেন। কুরী দম্পতি রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন। ১৮৫৭-৯৯ পর্যন্ত সময়ে এ পর্যন্ত অবিভাজ্য বলে বিবেচিত এটমের গঠনে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো উপাদানের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন কেম্ব্রিজের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত জে. জে. টমসন, ঐ বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলোর নাম দিলেন ইলেকট্রন। ১৯০২-তে রাদারফোর্ড এবং সডি রেডিও অ্যাক্টিভিটিস্-এর কারণ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। ১৯১১-তে সডি আইসোটোপ আবিষ্কার করলেন। এইসব আবিষ্কার পদার্থবিদ্যার ধ্রুপদী তত্ত্বে এক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল। পুনর্গঠনের প্রথম পদক্ষেপ দেখা দিল মার্কস প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম থিয়োরী অফ্ এনারজি-তে, যা গবেষণাপত্র হিসেবে উপস্থিত হল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ক্রীসমাস সপ্তাহে জার্মান ফিজিক্যাল

Scanned with CamScanner

সোসাইটিতে। এই তত্ত্ব পরিমার্জনা করলেন দিনেমার বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর। কোয়ান্টাম থিয়োরীর এই দুই রূপের মধ্যবর্তী সময়ে আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫-তে প্রকাশ করলেন তার স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি, যা সম্প্রসারিত হল ১৯১৫-তে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা 'জেনারেল প্রিন্সিপিলস্ অফ রিলেটিভিটিতে। এইভাবে পুরোনো, চেনা বস্তু পৃথিবীর চেহারাটা ধীরে ধীরে পাল্টে গেল। এরই সঙ্গে স্মরণীয় ওয়ারনার আইজেনবার্গ তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূত্রেই আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপিল বা অনিশ্চয়তাতত্ত্ব-এ পৌঁছেছিলেন। এরই সঙ্গে দেখা দিল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোঃসমীক্ষণতত্ত্ব। ১৮৯৫-তে ব্রুয়ারের সঙ্গে যুক্তভাবে 'সার্ভিস হিস্টিরিয়া' প্রকাশ করে ফ্রয়েড প্রথম মনোঃসমীক্ষণের সূত্রপাত ঘটালেন। ১৯১৮-তে প্রকাশিত হল ফ্রয়েডের অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ রচনা 'দি ইন্টারপ্রিটেশন অফ্ ড্রিমস্'। ম্যাক-ওয়েবার এবং এমিল ডারহাইম আধুনিক সমাজবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত সোয়েলের 'রিফ্লেকশনস্ অফ ভায়োলেন্স ; যাতে আধুনিক সমাজে মীথের কার্যকর ভূমিকা সম্বন্ধে উদ্দীপক ধারণাসমূহ প্রকাশ পেয়েছিল। এরই সঙ্গে নিৎসে-র চিন্তা-ভাবনার বিধ্বংসী, বিস্ফোরক অভিঘাত পড়ল পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতের উপর। নিৎসে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের আমূল পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করলেন। প্রথানুগত নৈতিকতাকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করে নিৎসে নৈতিকতাসম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে নিদারুণ আঘাত হানলেন। ১৮৮৯-তে প্রকাশিত হলো বের্গস-র 'টাইম এ্যান্ড ফ্রি উইল'—এই রচনায় বের্গসঁ আমাদের অভ্যস্ত প্রথাগত লজিকে থেকে মূলত ভিন্ন এক বিশেষ ধরণের সাবজেক্টিভ লজিককে স্বীকৃতিদানের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করলেন : এই সাবজেকটিভ লজিকের সাক্ষাৎ মেলে স্বপ্নে এবং মীথের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই সাবজেকটিভ লজিক বা ড্রিম লজিকের রূপায়ণই আমরা অগুস্ত স্ট্রীন্ডবার্গের নাটকে লক্ষ করি। এরই সঙ্গে মার্ক্সীয় সমাজদর্শনেরও অভিঘাত এসে পড়ল পাশ্চাত্য চিন্তাজগতের উপর। এই চিন্তাজগতের অভিঘাতও সাহিত্যসৃষ্টিতে সঞ্চারিত হল। যেমন—পাশ্চাত্য চিত্রকলার নতুন নতুন উদ্ভাবন, বিশেষ করে ফরাসী কবিদের আলোড়িত করেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯০৭ সালেই আঁকা হয়েছিল পাব্লো পিকাসোর লে দামোয়াগেল দা ভিনিয়োঁ (দাভিনিয়োঁর কুমারীরা) নামক যুগান্তকারী চিত্র, যা চিত্রকল্প সম্পর্কিত পুরোনো ধারণাকে আমূল বিপর্যস্ত করে দিল।

১৮৮৩-তে দিনেমার সমালোচক জর্জ ব্রান্ডেস-এর 'মেন অফ দি মডার্ণ ব্রেক থ্রু'—শীর্ষক সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীর যে এক পর্যায় প্রকাশিত হয় তাতেই প্রথম মডার্ণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সমস্ত জার্মান ভাষাভাষী জগতে ব্রান্ডেস-এর বিপুল প্রতিষ্ঠা হেতু 'মডার্ণ'—এই বিশেষণটি পরিণত হয় এক অপ্রতিরোধ্য শ্লোগানে। ১৮৮৫ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত হয় একটি কবিতা সংকলন, ইংরেজিতে এর ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় 'মডার্ণ পোয়েট ক্যারেকটারস্'। এতে কালাপাহাড়ী মনোভাবসম্পন্ন কবিদের প্রতি নতুন প্রজন্ম তাঁদের কথাকে প্রত্যয়-স্পর্ধিত স্বরে প্রকাশ করলেন এবং নতুন প্রজন্মের লেখকরা নতুন কিছু করতে চাইলেন। আধুনিক ইংরেজি কবিতার সূত্রপাতের পিছনে অন্যতম প্রবর্তনা যুগিয়েছিল, শেষ ভিক্টোরীয় কবিতার ভাবদীন প্রকরণগত ঔজ্জ্বল্য এবং জর্জীয় কবিতার নিরক্ত অতি-সংকীর্ণ গার্হস্থ্য তুচ্ছতা-বিলাস—এ দুয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

Scanned with CamScanner

ইয়েটস্-এর 'দি গ্রীন হেলমেট' (১৯১০)-এ আধুনিক ইংরেজি কবিতার সূচনা ঘটে। ১৯১৭-তে প্রকাশিত এলিয়টের 'দি লাভ সং অফ জে. আলফ্রেড প্রুফ্রক' ; যার শুরুতেই লক্ষ করা গেল চমকপ্রদ এক চিত্রকল্প, যেখানে টেবিলের ওপরে ওষুধে আচ্ছন্ন রোগীর উপমা ও চিত্রকল্প সম-সময়ের অসুখ উদ্ঘাটিত। ১৯২২-এ এলিয়টের দীর্ঘ কবিতা— 'The West Land' এক দারুণ বিস্ফোরণ ঘটালো। এর প্রথম অংশ "The Burial of the Dead'-এ এলিয়ট বললেন—'Unreal city,/Unreal the brown fog of a winter dawn'-এর কথা। ক্রমে পঞ্চম অংশে মূর্ত হল বৃষ্টিহীন রুক্ষ বন্ধ্য পাথুরে জমির চিত্রকল্প এবং এরই সঙ্গে ফুটে উঠল সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসের দুঃস্বপ্ন : 'London Bridge is falling down falling down falling down'. ১৯২৫-এ প্রকাশিত হল ফাঁপা মানুষ ও ঠাসা মানুষের করুণ, রিক্ত ভাবচ্ছবি। ইংরেজি কবিতায় আরেক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন এজরা পাউণ্ড, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে যাঁর দুঃসাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণ নেতৃত্ব সূচিত হয়েছিল ইমেজিস্ট আন্দোলনে। সবচেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিতীয় পর্যায়ের জাপানী কবিতার দৃষ্টান্তে পাউণ্ড আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতায় সঞ্চারিত করতে চাইলেন চিত্রময়তা, অপ্রয়োজনীয় শব্দ-ব্যবহার পরিহার করে রচনায় আনতে চাইলেন ঘনতা, সংহতি, সংশক্তি। তিনি ফ্রি-ভার্স বা মুক্তক ছন্দ অবলম্বনে আধুনিক কাব্যবিশ্বকে অনেকদূর প্রসারিত করে দিতে চাইলেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যেও নানা সাহিত্য-আন্দোলন আধুনিক কবিতার উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করল। ফরাসি সাহিত্যের শার্ল বোদলেয়র-এর 'ফ্ল্যর দ্য মল'-এ প্রথম সূচিত হল আধুনিক ভাবকল্পনা। Evil বা অশিবের মধ্যে দিয়ে বোদলেয়র প্রকাশ করলেন তাঁর আলোক-তৃষ্ণা। তাঁরই অনুগামী ভের্লেন তাঁর বেদনা-বর্ণিল উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে, র‍্যাঁবো ইন্দ্রিয়সমূহের বিপর্যয়-সাধনের অভিজ্ঞতা-সঞ্জ অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আধুনিকতাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিলেন। আবার বোদলেয়ারেরই 'করেসপণ্ডেন্স' শীর্ষক সনেটে সিম্বলিজিম্ বা প্রতীকবাদের পূর্বাভাস সূচিত হল। প্রতীকবাদীদের শিরোমণি স্তেফান মালার্মে ধ্বনিসংগীত মূর্ছিত শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী কবিতা লেখার প্রয়াস পেলেন। আবার মালার্মের ভাবশিষ্য পোল ভালেরির ধারণায় কবি হয়ে উঠলেন একজন নিরুত্তাপ বৈজ্ঞানিক, একজন সূক্ষ্ম স্বপ্নদ্রষ্টার সহায়তায় আগতপ্রায় একজন বীজগণিতজ্ঞ। আবার পরবর্তীকালে রুমানীয় সাহিত্যসন্ধানী ত্রিস্তান জারা-র ডাডাইজম আন্দোলনের নেতিবাদী আঘাতের পরে ফ্রান্সে আঁদ্রে ব্রেতঁ-র নেতৃত্বে দেখা দিল স্যুররিয়ালিজম। লুই আরাগঁ এবং পোল অ্যালুয়ার—এই দুইজন প্রধান পরাবাস্তববাদী কবি অবশ্য পরে সাম্যবাদী বিশ্বাসে দীক্ষিত হলেন। জার্মান সাহিত্যে হেল্ডারলিনের শান্ত গীতলতায় এবং রিল্‌কের নৈর্ব্যক্তিক কবিতায় সংহত রূপবিন্যাসে আধুনিকতা প্রথম সূচিত হল। কিন্তু আধুনিকতার তীব্র সোচ্চার অভিব্যক্তি দেখা দিল একস্‌প্রেসনিজম আন্দোলনে। এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় হিস্পানী কবিতায় রুবেন দারিও-র নেতৃত্বে সংগঠিত মর্পেনিজ্‌মো আন্দোলনের, যে আন্দোলনের প্রবাহ অনুসরণ করে পাশ্চাত্য আধুনিক কবিতায় দেখা দিলেন লোরকা, হিমনেথ, মাচাদো, রাফায়েল, আলবের্তি প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটানোর জন্য উপায় ছিল বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা এবং আধুনিক কাব্যসৃষ্টির এইসব উজ্জ্বল নিদর্শন থেকে বাংলা আধুনিক কবিরা আলোকিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের একটি অনুধাবন উল্লেখ্য :

Scanned with CamScanner

'রবীন্দ্রনাথের কবিতাচর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না, অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভালেরি, রঁসার ও ইয়েটস ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঙর্থক মনন-বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।' (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতার কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭০)

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় আত্মস্থ করে নিলেন কীটস্, বোদলেয়রের প্রেরণাদাতা এডগার এলান পো-র কবিতার সঙ্গে সঙ্গেই উইলিয়ম বাটলার, ইয়েটস্-এর প্রথম এবং পরবর্তী পর্যায়ের একাধিক কাব্যোচ্চারণ। এলিয়টের প্রাণ-নায় সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র মধ্যে মূর্ত হল ঐতিহ্যচেতনা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও আত্মসচেতনতা। মালার্মের দৈব-পরিহার করে শব্দ-শরীর নির্মাণের প্রয়াসকে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আবাহন করলেন। বিষ্ণু দে পোল এলুয়ারের থেকে দীক্ষা নিলেন প্রেম ও সংগ্রামের সমীকরণ বিষয়ে এবং লোরকার মতোই লোকজীবনকে সমকালীন তাৎপর্যে তুলে আনতে সচেষ্ট হলেন। অমিয় চক্রবর্তী রবি-চুম্বকে সংলগ্ন না থেকে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুদূরবিচ্ছিন্নতায় বিদেশে গিয়ে আধুনিক কাব্য-ভাবনা—বিশেষতঃ আঙ্গিকবিষয়ে উদ্বুদ্ধ হলেন এলিয়ট-পরবর্তী ইংরেজি কবিতার প্রধান চারজন কবি—এডেন, স্পেন্ডার, ডে লুইস, ম্যাকনিসের এবং রবার্ট ফ্রস্ট, মারিয়ান ম্যুর, কামিংস প্রভৃতি মার্কিনী কবিদের কবিতা থেকে। এজরা পাউণ্ড, ডি. এইচ. লরেন্স প্রভৃতি কবিদের কবিতায় সঞ্চরণ থেকে সংবৃত হয়ে বুদ্ধদেব বসু পরবর্তীকালে বোদলেয়র ও রিলকের কাব্যের নিবিষ্ট একাগ্র পঠনে নিরত হলেন, যার ফলে পরবর্তী সময়ে তাঁর কাব্যে দেখা দিল ঘনতা-সংহতি।

প্রকৃতপক্ষে দুই যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবী মানুষকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে—সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্নতা, সংশয়, ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা, অনিশ্চয়তাবোধ, নেতির ধারণা, অনিকেত মনোভাবের অমোঘ তাড়না। স্টিফেন স্পেন্ডার কথিত 'destructive element' তথা বিধ্বংসী উপাদানের প্রত্যক্ষতা কিংবা উপলব্ধিতে আক্রান্ত হয়েছে যুগমানস, এলিয়টের কবিতাতে তা ধরা পড়েছে গভীর আর্তিতে স্তবক থেকে স্তবকান্তরে। যান্ত্রিক জীবনে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও তার সুফল লাভ করলেও যন্ত্রনির্ভর জীবনের অমোঘ পরিণতিতে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্নতার সংকটে—এমনকি আত্ম-বিচ্ছিন্নতার সংকট মানুষকে করেছে দীর্ণ। জীবনের এই সব লক্ষণ অনিবার্যভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের মধ্যেও ছায়াপাত করেছে। তাই সবই ক্ষণায়ু—কোন কিছুই চিরন্তন হতে পারে না এবং স্থায়িত্বে পরিণতি লাভ করতে পারে না—এমনটাই মানবিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' গ্রন্থে আধারিত বিনয়ঘোষের মন্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করা যায় :

> এ অবস্থায় সমাজস্থ প্রতিটি মানুষই নিরুতিশয় একাকিত্ব, গভীর অনিশ্চয়তা, তীব্র উৎকণ্ঠা ও দুর্মর নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত হয়ে পরস্পর থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, এবং এভাবে কেটে যায় সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সঙ্গতির সুর তাল লয়। (কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৫৪)

জীবনের এই পরিবর্তিত রূপ আধুনিক কবিতায় শুধু বিষয়বস্তু হিসেবে দেখা দেয়নি, বিষয়বস্তুও প্রয়োজনমতো খুঁজে পেতে চেয়েছে আঙ্গিককে। প্রথাজীর্ণ দীর্ঘবিস্তারী শিথিল

Scanned with CamScanner

প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তে আদৃত হয়েছে সংহত গঠনসৌষ্ঠব—চিত্রকল্প, প্রতীক, রূপক, শব্দ-সন্নিবেশ—ইত্যাদির ব্যবহারও পরিবর্তিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিংবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে বাঙালির মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বদেশি উন্মাদনার প্রকাশই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য মহাদেশে যে শূন্যতা, অনিশ্চিতি, বিশ্বাসহীনতার জন্ম দিয়েছিল প্রাথমিকভাবে আমাদের দেশে তা দেখা দেয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে উদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি শিক্ষাদীক্ষায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হলেও ব্রিটিশের কৌশলেই ক্রমেই রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বজাতি ও স্বদেশ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর তৃতীয় দশকের শেষভাগে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা—পুঁজিবাদের ক্রমবৃদ্ধিতে জীবনে অনিশ্চয়তা, সংশয় দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকৃত অসঙ্গ তিপূর্ণ বিকাশ এবং এর প্রভাবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে চারিয়ে যাওয়া 'বিকৃতি' ও 'বিসঙ্গতি'-র প্রভাবে বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ : বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬১) দেখা দিতে থাকে নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা। পূর্ববর্তী সনাতন প্রেমের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে, প্রেমও আক্রান্ত হয়েছে অনিশ্চয়তাবোধে। এই সব সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলো তথা অসঙ্গতি তীব্র অভিঘাত লক্ষ করা গেল বাংলা আধুনিক কবিতাতেও। জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখের হাতেই বাংলা আধুনিক কবিতা রূপ পরিগ্রহ করল।

জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন 'কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস,/যক্ষা রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন—' (জীবন-১৬)। কালোশিরা, বধিরতা, কুঁজ, গলগণ্ড ইত্যাদি শরীরী ব্যাধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, নষ্ট শসা কিংবা পচা চালকুমড়োর ছাঁচে মানুষের হৃদয়েও ফলে ওঠে। যুগ-পরিস্থিতি কবিকে গভীর হতাশাগ্রস্ত করে তুলে এই উপলব্ধিতে নিয়ে যায় : 'পৃথিবী বুঝি ধ্বংসপ্রায়' (ভয় মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝার তীব্র অভিঘাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কিভাবে ব্যক্তিজীবনে গভীর অনিশ্চয়তা ও বিষাদময় অমোঘ পরিণতি ঘনিয়ে তুলেছে তার দীর্ঘবিস্তারী পরিচয় ১৯৪০-এ লেখা সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' কবিতাটি। 'মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস'; ব্যক্তিপ্রেমও এখানে অনিশ্চয়তা তাড়িত, পরিণতিহীন—প্রেমের উপভোগও পরিণামচিন্তায় ব্যাহত। অমিয় চক্রবর্তী একাধিক কবিতায় প্রকাশ করেছেন যুগান্ত-ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত মৃত্যুদীর্ণ হাহাকারকে (যুদ্ধের খবর)-এর মাঝে 'নোঙর' খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াসকে (প্রাগতিক)। পুঁজিবাদী সভ্যতার মারণ-রূপের প্রেক্ষিতে গভীর নিঃসঙ্গতার বেদনা উচ্ছ্রিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'বিচ্ছেদের-দিন' কবিতায়। এ হেন উপদ্রুত পরিস্থিতিতে কবি-নায়কের 'বাঁচা পিষে যায়' (উদ্বাস্তু)। জীবনানন্দের কবিতার নায়ক-প্রেমিক 'রণ-রক্ত-সফলতা'-র আগ্রাসনে শুভচেতনার পরিসর খুঁজে পান না বলেই সুচেতনাকে 'দূরতর দ্বীপ' বলে প্রতিভাত হয় (সুচেতনা)। সব শুভের বিনষ্টি উঠে আসে জীবনানন্দের লেখনীতে : 'কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।/চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।/মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর; /যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল; /মানুষের লালসার শেষ নেই/ উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতু ক্ষণ/অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ/অপরের মুখ ম্লান করে

Scanned with CamScanner

দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।' (এই সব দিনরাত্রি)। সনাতন প্রেমের ধারণা তথা মূল্যবোধ এভাবে বিপর্যস্ত হয়, মহনীয় আদর্শ 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য' (অদ্ভুত আঁধার এক) রূপে পরিগণিত। কবি আর চিরন্তন প্রেমের সন্ধানী হন না বলেই কবি-প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—'অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ, অসংগত চির প্রেম—' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মহাসত্য)। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ যুগমানস উঠে এসেছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়—নাস্তির গর্ভে নিত্যবিধাতার জ্যোতির্ময় সিংহাসন নিমজ্জমান। এই নেতির ভাবটি সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা প্রকট, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর্ত সংশয়বোধ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে—'ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?/নেই তুমি যথার্থ কি নেই?/তুমি কি সত্যই/আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন?' (প্রশ্ন) আর বুদ্ধদেব চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টির দ্বিতীয় ভুবন গড়ে তুলতে ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হয়েই। প্রেমের অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি কামনা-বাসনা-সংলগ্ন। নজরুল—বিশেষত ব্যাপকভাবে মোহিতলালের মধ্যে বিষয়টি এলেও বাস্তববাদী চিন্তাধারার তীব্র প্রকাশরূপেই অকুণ্ঠ অলজ্জ দেহগত কামনার ছবি ফুটে উঠেছে বুদ্ধদেবের কবিতায়— 'একমাত্র কামনা অমর—/এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা—' (মোহমুক্ত)। তিনি আরেকটি কবিতায় অকপটে উচ্চারণ করেছেন : 'যে-মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবি/খসে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়জলে/সর্বঘ্ন তিমির তলে অলজ্জ বদ্বীপ,/অমনি থমকে কাল;' (দময়ন্তী)। এধরণের অভিব্যক্তি তীব্রতা পেয়েছে সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায়—'স্খলিতবসন ঊরুতে তোমার/অনাদি নিশার শান্তি উদার;/ নব দূর্বার চিকন পুলক ও-বরদেহে।' (অর্কেস্ট্রা) কিংবা 'অলকনন্দার আগমনী / শুনিনি সে-দিন কানে; গর্জেছিল আমারই ধমনী / বাঁধ-ভাঙা রিরংসার আবিল বন্যায়; / মরুবাসী বর্বরের প্রায়, / অনভ্যস্ত সুসময়ে লজ্জাবস্ত্র কাড়ি, কুচকলি নিঙাড়ি নিঙাড়ি, / মিটায়েছিলাম তৃষ্ণা, সুধা ভেবে, পর্যুষিত ক্লেদে।' (উদ্ভ্রান্তি) বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় শরীরী আকাঙ্ক্ষা প্রচলিত সংস্কারছিন্ন বিদ্রোহাত্মক ইন্দ্রিয়চেতনার রূপ লাভ করেছে এবং প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী থাকার আর্তি বাংলা কবিতায় প্রথম দেখা দিয়েছে। এহেন আত্মবিরোধে উঠে এসেছে প্রবৃত্তির টানে কবিকৃত সুন্দরের ধ্যানের বিনষ্টি। বিষ্ণু দে-র কবিতায় কবি-প্রেমিক পুরূরবার মতো নয়, আসঙ্গ-লোলুপ নায়কের মতো ক্ষণিকের মর অলকায় ইন্দ্রিয়ের হর্ম্যে রচিত বাসনার ভুবনে নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায় উর্বশীর কাছে (উর্বশী)।

সংশয়-বিচ্ছিন্নতা যুগের অমোঘ নিয়তি-রূপে দেখা দিয়েছে। সমাজ-সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্নতার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর 'উদ্ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা/নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।' (সোহবিভেক্স্যাদেকাকী বিভেতি) মানুষের মাঝে নিঃসঙ্গ পথিকরূপে ধাবমান কবি আরো পরে মার্কসবাদে আস্থাশীল হয়ে তবেই এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। সুযোগসন্ধানী অবক্ষয়তাড়িত মধ্যবিত্তের সংশয়াচ্ছন্ন ক্লিষ্ট ত্রিশঙ্কু রূপ উঠে এসেছে সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী' কবিতায়। পুঁজিবাদী সভ্যতায় অর্থ ও সমাজের অসাম্য মানুষের মধ্যে আনে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ—প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা, সমাজবিচ্ছিন্নতা—এমনকি সত্তা-বিচ্ছিন্নতা এইসব আধুনিক কবিদের রচনায় বার বার ব্যক্ত হয়েছে। সত্তা-বিচ্ছিন্ন

মানুষের কথা আসে জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতায় : 'সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজেরে মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?—এই মানুষই ক্রমে প্রশ্নতাড়িত হতে থাকে : 'বলি আমি মনেরে সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়?' সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষের একাকিত্ব, শূন্যতা, অসহায়তা আরো তীব্র দুর্বিসহ এক ক্লান্তির কথা ব্যক্ত করে 'আট বছর আগের একদিন কবিতায়। বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত বুদ্ধদেব বসুর কবি-নায়ক বলে ওঠে—'জীবন এখন ক্লান্ত, ক্লান্ত, আর ছিন্ন' (ভবিষ্যৎবাণী)। আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রকাশ পায় সমকালীন বাসছাড়া মনোভাব—এক ছিন্নমূল সত্তার অনিকেত মনোবৃত্তি। যেমন : 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যগ্রন্থের 'কোথায় চলেছো পৃথিবী' কবিতায় একাধারে আশ্রয়হীনতা ও আশ্রয়ের অভিমুখে গমনের প্রয়াসে নিহিত রয়েছে যুগের অনিকেত মনোভাব। এই মনোভাবই পরবর্তীকালে 'বাসাবদল' কবিতায় তীব্র অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

আধুনিক কবিরা প্রত্যেকেই আধুনিক মনোভাব তথা বিষয়বস্তুর উপযোগী কাব্যশরীর নির্মাণে তৎপর হলেন পূর্বোক্ত বৈদেশিকদের নানা উজ্জ্বল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মতোই শব্দকে কবিতার মুখ্য উপাদানরূপে গ্রহণ করে তাঁর রচনাসমূহকে সচেতন প্রযত্নে শব্দ-প্রয়োগের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করেছেন। লুই আরাগঁ-র প্রাণনায় বিষ্ণু দে আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষায় মনোযোগী হলেও আঙ্গিকসর্বস্বতায় গ্রস্ত হননি। বাংলা কবিতার স্তবক ও পঙ্‌ক্তি-নির্মাণে নতুনত্ব আনলেন অমিয় চক্রবর্তী। বিশেষত কবিদের উপমা, চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীক, শব্দ ব্যবহারেও পরিবর্তিত পৃথিবীর রূপ প্রকাশ পেল। উপমায় আধারিত হল ব্যাধিগ্রস্ত জীবন : 'রোগীর জ্বরের মত পৃথিবীর পথের জীবন; / অসুস্থ চোখের (জীবন) পরে অনিদ্রার মতন অসুখ; জীবনের উপমান হয়ে উঠেছে 'রোগীর জ্বর'। আর এ ব্যাধিগ্রস্ত পথে হেঁটেই কবিসত্তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে থাকে—'ছিঁড়ে গেছি, —ফেঁড়ে গেছি, —পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে —' (১৩৩৩); এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহৃত ছিঁড়ে, ফেঁড়ে-র উল্লেখ লক্ষণীয়। সময়ের শুষ্কতা, রুক্ষতা ফুটে ওঠে ফণিমনসার অনুষঙ্গতাড়িত মরুভূমির চিত্রকল্পে, যা এলিয়টের কবিতার রুক্ষ, বন্ধ্য পোড়ো জমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : 'নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম / ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরু-মায়া সম।' (অনুষঙ্গ) আরো পরে বহুদূরবিস্তারী মরুভূমির প্রেক্ষিতই প্রধান হয়ে ওঠে 'উটপাখী' কবিতায় বাস্তববিমুখ মধ্যবিত্তের সংকটপূর্ণ অবস্থার প্রকাশে। প্রেমের বিনষ্টি উঠে আসে সুধীন্দ্রনাথ-কৃত বৈশাখী-রূপ-সমন্বিত চিত্রকল্পে—'রুদ্র কালবৈশাখীর প্রহারে প্রহারে/অর্পণ সে—উপবন, যার মাঝে নষ্টনীড় স্মৃতি/ঘুরে মরে নিতি ....' (সঞ্চয়) প্রেম বিশ্বাসভঙ্গের রূঢ়তায় আক্রান্ত হয় বলেই কবি-প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়— 'রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ-আঁধার হেডিসের মতো হৃদয় ধরেছে চেপে।' বিষ্ণু দে-র এই 'ওফেলিয়া' কবিতার অংশে উপমেয় এবং সাধারণ ধর্ম তীব্র যন্ত্রণারই পরিচয়বাহী। ফলদ পরিণামহীন চোরাবালির প্রেক্ষিত বিস্তারিত হয় বিষ্ণু দের কবিতায় চোরবালির রূপকে (চোরাবালি)।' 'ফাটা ডিম' প্রতীকে সুধীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন যুগের বিপর্যস্ত মূল্যবোধকে। এই সব কবিদের কবিতায় উঠে আসে যুগ-পরিস্থিতির প্রকাশক বহু শব্দ; যেমন—শূন্য (বোধ), শূন্যতা (ভয় মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে), ক্লান্ত/কান্তি (আট বছর আগের একদিন), একা (পূর্বোক্ত কবিতায়)। জীবনানন্দের বোধ এই সব শব্দ-

Scanned with CamScanner

ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্যদের কবিতায় রয়েছে আরো অনেক শব্দের অমোঘ ব্যবহার— নিঃসঙ্গ (সর্বনাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), একাকী (সোহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি, বিষ্ণু দে), বিচ্ছিন্ন (পূবোক্ত)। বিচ্ছিন্ন শব্দটি জীবনানন্দের কবিতাতেও এসেছে—যেমন : 'প্রেমিক' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের ভগবানে অবিশ্বাসের সূচক হয়ে উঠেছে 'নাস্তি' এবং 'অমা' শব্দ দুটি, তাঁর একাধিক কবিতায় এই শব্দগুলো ঘুরে ঘুরে এসেছে।

গদ্য-পদ্যে নির্বিরোধ সাধিত হল এইসব কবিদের কলমে। যেমন : 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে/বিয়োবার দেরি নাই, —রূপ ঝরে পড়ে তার, —' (অবসরের গান, জীবনানন্দ দাশ)। রূপশালি ধানে ভরা পাড়াগাঁর পরিপূর্ণ রূপ উঠে আসে কথ্যশব্দের উপযুক্ত ব্যবহারে। আটপৌরে শব্দের ব্যবহার সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি গদ্য-পদ্যের বিবাদ-ভঞ্জন ঘটানোর সপক্ষেই বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। যেমন : 'উটপাখী' কবিতায় এনেছেন : 'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?/মনস্তাপেরও লাগবে না ওতে জোড়া।' সুধীন্দ্রনাথের ভাষা কথ্য আটপৌরে শব্দ-ব্যবহারের পাশাপাশি অনায়াসেই আত্মস্থ করে নিয়েছে বাংলা বাগ্‌ধারা-প্রবাদপ্রবচনকে। এই ধরণটি বিষ্ণুদের মধ্যে লক্ষ করা যায় তাঁর 'চোরাবালি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকেই। লোক-প্রবাদ ব্যবহারের একটি সার্থক উদাহরণ— 'চাচা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে / শিং ভেঙে মিশে স্বার্থে শত্রুমিত্র। (১৯৩৭-স্পেন, পূর্বলেখ)

ঐতিহ্যে আস্থাশীল আধুনিক-কবিমন পুরাণের ভাবানুষঙ্গ গ্রহণ করেছে, কখনওবা পুরাণপ্রতিমার উপস্থাপনে কবিতাকে করে তুলে ব্যঞ্জনাগর্ভ। বিষ্ণু দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ-অনুষঙ্গকে যুক্ত করেছে—'উর্বশী ও আর্টেমিস'। তাঁর কবিতায় ওফেলিয়া, ক্রেসিডা, কাসান্ত্রার মতো গ্রীক নায়িকার পাশাপাশি মহাশ্বেতার মতো প্রাচ্য পুরাণোক্ত নায়িকা উঠে এসেছে। ওফেলিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে যুগ-নায়কের বিশ্বাসহীনতার জগৎ উদঘাটিত হয়েছে। যুগের সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য কবি গ্রীক নায়িকা ক্রেসিডাকে আহ্বান জানান। প্রেমের তপস্যার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা। সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' কবিতায় বারবার উপনিষদের অনুষঙ্গ থাকলেও সামগ্রিকভাবে ঔপনিষদিক ভাবনার অস্বীকৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলার মধ্যে উপনিষদ-উক্ত হিরণ্ময় জ্যোতির্ম্ময় পাত্র অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলের আবরণ উন্মুক্ত সত্যের কথা উঠে এসেছে। সে সত্য কিন্তু ঔপনিষদিক ব্রহ্মের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করেনি, বরং জীবনসম্বন্ধে নাস্তিবাদী নঞর্থক সত্যকেই প্রকাশ করেছে। লোকপুরাণকে সমকালীন তাৎপর্য তুলে আনার উজ্জ্বল উদাহরণ হল বিষ্ণু দে 'সাত ভাই চম্পা কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা। 'চম্পা' কবিতায় চম্পা দেশে-দেশে ব্যাপ্ত শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু দে-র একাধিক কবিতায় চম্পার অনুষঙ্গ ছাড়াও লালকমল, নীলকমল, সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর মোটিফ কখনও বা অনুষঙ্গ কিংবা কাহিনী সমকালীন তাৎপর্যে মন্ডিত হয়েছে সমাজ-রাজনৈতিক বীক্ষার প্রকাশে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালক কিংবা বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় রূপকথার ভিন্ন প্রসঙ্গে অনুষঙ্গ কবির ইতিহাসচেতনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র এই দুই কবির কবিতাতে নানা মাত্রায় ঘুরে ঘুরে এসেছে ভিন্ন

এবং মুশায়েরা

Scanned with CamScanner

ভিন্ন প্রসঙ্গে লোকঐতিহ্যের সঙ্গে শেকড়-টান থেকেই।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় এই কবিরা রবীন্দ্রদ্রোহিতা থেকে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভুবনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণের মধ্যে দিয়ে। উত্তর-রাবীন্দ্রিক হবার প্রয়াসেই তাঁরা ক্রমে 'জ্ঞানকৃত' ভাবে রবীন্দ্র-ঋণ ('তন্বী'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ) করেছেন। রৈবিক উদ্ধৃতির 'ইচ্ছাকৃত' ব্যবহারের কথা ঘোষণা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে (১৯৩৫)। নিছক রবীন্দ্রনাথের রোমন্থন নয়, স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এমন কিছু রবীন্দ্র ঋণের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

স্বর্গ হ'তে বিদায়ের কালে/মনে রবে সেই কথা, প্রেমার্ত ক্ষণিকা (কস্মৈ দেবায়)
দিবে না কি ধরা তুমি,/ওগো কৌতুকময়ী? (অর্কেস্ট্রা)
ভৈরব রভসে হানি, যে-প্রেরণা ফুরালো নিমেষে (পণ্ডশ্রম)

'স্বর্গ হ'তে বিদায়', 'কৌতুকময়ী', 'ভৈরব রভসে' এইসব রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ তথা শব্দব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন অভিব্যক্তি লাভ করেছে এইসব কবিতায়। বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও রবীন্দ্র-অতিক্রমণের পথ অবারিত হয়েছে উভাবনী প্রতিভাবলেই। যেমন : 'বেকার বিহঙ্গ' কবিতায় বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ দেখান নিরন্তর কর্মসন্ধানে রবীন্দ্রনাথের বহুশ্রুত কাব্যপঙ্‌ক্তিকে নিজস্ব নির্মাণে আত্মস্থ করেই—'তবু বিহঙ্গ; ওরে বিহঙ্গ মোর/কোরো না না অন্ধ বন্ধ জটায়ু পাখা।।'

এভাবেই পরিবর্তিত যুগ-পরিস্থিতিতে কখনও রবীন্দ্র-বিমুখতা, কখনওবা পাশ্চাত্য-কাব্য পরিক্রমা, কখনও রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই এইসব বাংলা আধুনিক কবিরা বাংলা আধুনিক কবিতার যাত্রাপথকে অবারিত করেছে। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে সমকালীন পরিমণ্ডলকে কমবেশি স্বীকৃতি দিয়ে গূঢ় গভীর ইঙ্গিতময় উপস্থাপনে স্বতন্ত্র এক স্বকীয় কাব্যভুবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা—রবীন্দ্র-যুগের অবসানে এভাবেই রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার নতুন যুগের আবির্ভাব সত্য হয়ে উঠেছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা আধুনিক কবি—পিনাকেশ চন্দ্র সরকার
আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ—অরুণকুমার ঘোষ

Scanned with CamScanner